এখনও জীবিত। কানায় কানায় প্রাণবন্ত। ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে খেলোয়াড়ী ঢাইলে আপন মনে রাজপথে হাঁটলে তেমন অসাধারণ কিছু মনে হবে না। পঞ্চাশ দশকে যাঁরা তাঁকে খেলার মাঠে দেখেছেন, তাঁর প্রতি তাঁদের অবাক করা চাহনি অনেক কিছুই মনে করিয়ে দিবে। কথায় আন্তরিকতা, বাচন ভঙ্গীতে বিশুদ্ধতা এবং প্রকাশে দৃঢ়তা যে কোন মানুষকে তাঁর বাস্তব খেলোয়াড়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। তিন অক্ষরে যে নামটি এককালে শুধু তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে নয়, সারা পাকিস্তানের ফুটবলে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং মধ্য মাঠের দুর্ভেদ্য খেলোয়াড়রূপে চিত্রিত করেছিল সেই ফজলুর রহমান আরজুকে আজ হঠাৎ করে আবিষ্কার করতে হচ্ছে অন্যভাবে এককালের বয়োজ্যেষ্ঠ্য সহযোগী খেলোয়াড় হিসাবে ।

তাঁকে যা দেখেছি আজ তাঁর মন মানসিকতায় সেই প্রতিধ্বনি নির্ভুল শুনতে পাচ্ছি। আচার আচরণে কোথাও এক বিন্দু ঘাটতি নেই। কিছুদিন আগে একদিন আচমকা তিনি এলেন। বসলেন কিছুক্ষণ। বললেন নানা কথার মাঝে খেলাধুলার অনেক কথা। দিয়ে গেলেন কিছুটা প্রত্যয় ও সংশয়। ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় আমাদের আগত পরিকল্পনার রূপরেখার একটুকরো আভাস মনে হল , খেলার মাঠে আমরা যা হারিয়েছি তাঁর যেন কিছুটা তিনি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন।

আরজু নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার থানার দুপতারা গ্রামের ছেলে। জন্ম ১৯৩০ সালে। মুন্সিগঞ্জ কলেজ হয়ে ঢাকায় খেলতে আসেন। প্রথমবারেই প্রথম বিভাগে ই পি জিমখানায় তাঁর খেলোয়াড়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এ দলটি ১৯৪৯ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। এ দেশের বড় খেলোয়াড়দের মধ্যে ঢাকা লীগে প্রথম এসেই প্রথম বিভাগে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জনের দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী একমাত্র তিনিই। এখান থেকেই তিনি এগিয়ে আসছেন একটানা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। ওয়ান্ডারার্স, মোহামেডান, ভিক্টোরিয়া, ইস্পাহানী, আজাদ স্পোর্টিং (আগাখান কাপে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান এবং পাকিস্তান দলে তাঁর পদচারণা একটি যুগ। একটি ইতিহাস এবং একটি আদর্শ। সেদিনের ক্রীড়ামোদী মানুষদের মনে তিনি আজও সদম্ভে জেগে আছেন। তাই দেশবাসীকে একটু পিছু তাকালে আজকের আরজুর কাছে তাদেরকে কিছুটা বিব্রত হতে হবে। এমনি একটি খেলোয়াড়ী কৃতিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

খেলার কদরে কাস্টমসে চাকরি নিয়ে বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় তৈরীতে তাঁর সাংগঠনিক অবদান একদিকে যেমন অনস্বীকার্য অন্য দিকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে খেলা ও খেলোয়াড়দের জন্যে পৃষ্ঠপোষকতা আদায়ে তাঁর যে ভূমিকা তা সত্যি প্রশংসনীয়। খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জনে যে ধরনের প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন খেলা থেকে অবসর নিয়ে সংগঠক হিসাবে সেই ধরনের ব্যস্ততা ও সময় দিয়ে প্রথম কাতারে স্থান করে রেখেছেন। কথার ফাঁকে একদিন তিনি হঠাৎ করে আপন মনে বলে ফেললেন, খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এখন কোন চিন্তা ভাবনা নেই। খেলায় ক্রমবর্ধমান হারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মান বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই বললেই চলে। বড় বড় খেলোয়াড়রা অনেকেই এখন খেলা থেকে বিদায় নেবার পর চুপ চাপ সরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে এক আধজন খেলোয়াড়কে নিয়ে মাত্রার বাইরে মাতামাতি হচ্ছে এবং পরাজয়কেই বাজিমাত বলে হৈ চৈ করা হচ্ছে। এটা ভাল লক্ষণ নয়। উপযুক্ত খেলোয়াড় ও সংগঠকদের খেলাধুলার পাশাপাশি অবস্থান এবং সেই সঙ্গে দক্ষতার মাপকাঠি একটি নির্দিষ্ট পরিসীমায় রাখা বাঞ্ছনীয়। জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের মঙ্গলের প্রতিও জাতীয় দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না।'

ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি অন্যদের সঙ্গে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড একসাইজ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড তাঁকে আজীবন সদস্য পদে ভূষিত করে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বললেন, 'চাকরি থেকে কিছুদিন আগে অবসর নিলাম। এক্সটেনশন বিষয়ে কেউ কিছুই দেখলেন না। আমার চেয়ে